কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

মাজায

(রূপক অর্থ)-এর

অপরিহার্যতা

মাওলানা মো. গিয়াস উদ্দিন (ফুলতলী)

CamScanner

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে
মাজায (রূপক অর্থ)-এর অপরিহার্যতা

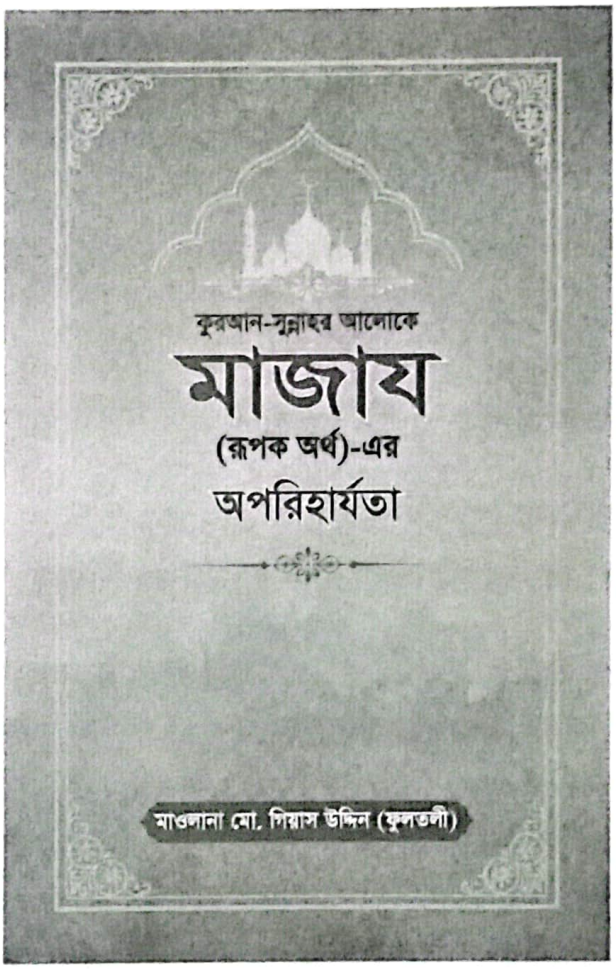

মাওলানা মো. গিয়াস উদ্দিন (ফুলতলী)

CamScanner

সূচিপত্র

হাকীকত ও মাজায	৮
কুফর ও ঈমান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সম্বন্ধের ধরন লক্ষ্য করা জরুরি	১২
শব্দের সম্বন্ধ পরিবর্তনের কারণে অর্থের পার্থক্য-	১৫
কখন ইদাফাত করা কুফর হয়	১৮
রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামের আগে 'সাইয়্যিদুনা' শব্দ ব্যবহারের বিধান	২৪
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামের পূর্বে মাওলানা ব্যবহারের হুকুম	২৯

CamScanner

ভূমিকা

ইসলামী আকিদা ও শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুধাবনের ক্ষেত্রে আরবি ভাষার মর্ম, শব্দের ব্যবহার এবং তার প্রাসঙ্গিকতা বোঝা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষত কুরআন-সুন্নাহর ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে শব্দের ব্যবহার, প্রেক্ষাপট এবং আরবি ভাষার অলংকারশাস্ত্র তথা বালাগাত সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। এজন্য হাকিকত ও মাজায এর আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আহলে হাদীস-সালাফী আলেমগন হাফিজ ইবনে তাইমিয়্যার মত অনুসরণ করে মাজাযের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। এর ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরবি শব্দের প্রচলিত ব্যবহার ও প্রাসঙ্গিক অর্থ বিবেচনা না করে শব্দের বাহ্যিক অর্থকেই চূড়ান্ত অর্থ হিসেবে গ্রহণ করেন। পরিণতিতে মাওলানা, গাওস, সায়্যিদুনা, কিবলাহ ইত্যাদি বহুল ব্যবহৃত শব্দের মর্ম না বুঝেই সেগুলোকে শিরক বা ভ্রান্ত আকিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন।

হাফিজ ইবনে তাইমিয়্যা মুজাসসিমাদের অনুকরণে শব্দকে হাকিকত ও মাজাযে বিভক্ত করার সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন–

وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف

"ভাষাকে হাকিকত ও মাজাযে বিভক্ত করা একটি বিদআত ও নবসৃষ্ট বিভাজন, যা সালাফগণ করেননি।" (মাজমূউল ফাতাওয়া, ৭/৮৮)।

অন্যত্র তিনি বলেছেন, এটি বিদআতি ও নাস্তিকদের মতবাদ। লা মাযহাবীদের অত্যন্ত আস্থাভাজন শাইখ ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর 'আল ফিকহুল আকবার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা' নামে একটি কিতাব লিখেছেন। উক্ত কিতাবে 'আল্লাহর নির্দেশনা গ্রহণ ও অনুমান নির্ভর কথা বর্জন' নামে একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন। উক্ত পরিচ্ছেদে তিনি লিখেন- কুরআনে আল্লাহ তাঁর পরিচয় সহজ ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। এজন্য মুমিনের বিশ্বাস করা উচিত যে, কুরআনে মহান আল্লাহ নিজের বিষয়ে যা বলেছেন তা সরলভাবে বিশ্বাস করা এবং এগুলো থেকে আল্লাহর মারিফত, ঈমান, মহব্বত ও ইবাদত অর্জন করাই মুমিনের দায়িত্ব। এ সকল বিশেষণের কোনো রূপক জানিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, এগুলোর সরল অর্থ বাদ দিয়ে কোনো রূপক অর্থ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলেও আল্লাহ জানাননি। এজন্য এ সকল বিশেষণের কোনো রূপক অর্থ আছে বলে দাবী করা যেমন ওহীর ইলম ছাড়া আন্দাজে আল্লাহর বিষয়ে কথা বলা, তেমনি কোনো একটি বিশেষণের এক বা একাধিক রূপক অর্থ নির্ধারণ করাও ওহীর জ্ঞান ছাড়া অনুমানের উপর আল্লাহর নামে কথা বলা। (আল ফিকহুল আকবার; বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা-২৯৬) অন্যত্র তিনি লেখেন, ওহীকে রূপকার্থে ব্যবহার করা বা ওহীর দূরবর্তী ব্যাখ্যা করার অর্থ ওহীকে অকার্যকর করা। (আল ফিকহুল আকবার; বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা-১৫৪)

CamScanner

তিনি আরো লেখেন, কোন বিশেষণকে ব্যাখ্যা করে তার সরল অর্থের বাইরে নিয়ে যাওয়ার অর্থ বিশেষণটিকে বাতিল করা। (আল ফিকহুল আকবার; বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা-২৯৫)

অন্যদিকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইমামগণ আরবি ভাষার স্বাভাবিক রীতি ও কুরআন-সুন্নাহর ভাষাগত ব্যবহারের আলোকে হাকিকত (শব্দের প্রকৃত অর্থ) ও মাজায (শব্দের রুপক অর্থ) উভয়কেই স্বীকার করেছেন। তাদের কাছে কোনো শব্দের অর্থ নির্ধারণ শুধু তার আক্ষরিক অর্থের ওপর নির্ভরশীল নয় বরং শব্দের ব্যবহার, বাক্যের প্রেক্ষাপট, ভাষার রীতি এবং সংশ্লিষ্ট দলিলও বিবেচ্য। শব্দের শাব্দিক অর্থ সবসময় যদি পবিত্র কুরআন হাদিসে প্রয়োগ করা হয়, তবে অনেক আয়াতের অপব্যাখ্যা করা হবে। যেমন মুজাসসিমারা এই অপব্যাখ্যার মাধ্যমে আল্লাহর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করেন। (নাউজুবিল্লাহ)

মুহাম্মাদ আব্দুল আজিম আয-যুরকানী (রহ.) মানাহিলুল ইরফান ফি উলূমিল কুরআন-এ বলেন–

إن حمل المتشابهات في الصفات على ظواهرها مع القول بأنها باقية على حقيقتها ليس رأيا لأحد من المسلمين، وإنما هو رأي لبعض أصحاب الديانات الأخرى : كاليهود والنصارى، وأهل النحل الضالة : كالمشبهة والمجسمة

আল্লাহর সিফাতের মধ্যে যেগুলো 'মুতাশাবিহ' সেগুলোকে বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা এবং বলা যে, সেগুলো প্রকৃত অর্থেই অবশিষ্ট আছে, এটি মুসলিমদের কারো মত নয়। বরং এটি কিছু অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের যেমন: ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মতামত এবং পথভ্রষ্ট দলগুলোর যেমন মোশাব্বিহা (আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য প্রদানকারী) মোজাসসিমা (আল্লাহর জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কল্পনাকারী) দের মত।

শব্দের বাহ্যিক কিংবা আক্ষরিক অর্থ নেয়ার দ্বারা খ্রিষ্টানরা যেভাবে অসৎ উদ্দেশ্যে ঈসা (আ.) কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছে সেভাবে ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসীরা আল্লাহর শানের খিলাফ বিভিন্ন কিছু সাব্যস্ত করে।

ইবন কাসীর (রহ.) লিখেছেন, খ্রিষ্টানরা ঈসা (আ.) কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করার জন্য পবিত্র কুরআনের দুটি শব্দকে (كلمة الله ও روح الله) দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে। (তাফসীরে ইবন কাসীর)

মাজাযের বিষয়টি আকিদার আলোচনায়ও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কারণ, যারা হাকিকত ও মাজাযকে অস্বীকার করে তারাই আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে তাফওয়ীদ ও তা'ওয়ীল কে অস্বীকার করে এবং আয়াতে মুতাশাবিহ এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে। অথচ কুরআন ও হাদিসের বহু আয়াত ও বর্ণনা এমন রয়েছে,

CamScanner

যেগুলোকে কেবল বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে এর মাধ্যমে বাতিল আকীদা সাব্যস্ত হবে। যা হাফিজ ইবনু তাইমিয়্যাহ ও তার অনুসারীগণ সাব্যস্ত করেছেন ।

হাফিজ ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন–

وَكُلَّ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَأَنَّهُ مَعَنَا حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتِهِ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি আরশের উপরে। আরো বলেছেন যে, তিনি আমাদের সাথে। প্রকৃতপক্ষেই তিনি আরশের উপরে এবং প্রকৃতপক্ষেই তিনি আমাদের সাথে। (শারহুল আকিদা আল ওয়াসিতীয়্যাহ-২৫৫, অনুবাদ-শায়েখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী)

তিনি তার মতবাদ প্রমাণ করতে গিয়ে বলেছেন-

وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ؛ مِنْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، عَلَى عَرْشِهِ، عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِه

এই উম্মতের সালাফগণ যেসব বিষয়ের উপর একমত হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করাও আল্লাহর প্রতি ঈমানের মধ্যে শামিল। তার মধ্যে এও রয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আসমানসমূহের উপরে অবস্থিত আরশের উপর এবং সকল মাখলুকের উপর। (শারহুল আকিদা আল ওয়াসিতীয়্যাহ-২৫০, অনুবাদ-শায়েখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী)

প্রখ্যাত আহলে হাদিস আব্দুর রউফ খুলনা সাহেবের বক্তব্য যা সংকলন করেছেন মদিনা ইউনিভার্সিটি থেকে ডিপ্লোমা অর্জনকারী জনাব জহুরুল হক সাহেব। তিনি নিম্নোক্ত হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আক্ষরিক অনুবাদ করে লিখেছেন -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ

কোন স্থান ছেড়ে কোন স্থানে পৌছাঁবার নাম যাওয়া, উপনীত হওয়া, স্থান ত্যাগ করে যথাস্থানে পৌঁছাবার পর পুনরায় ফিরার নাম আসা। আল্লাহ যখন কোথাও যান তখন অবশ্য সে স্থান ত্যাগ করতে হয়। আবার যখন পৌঁছান তখন সেখানে অবস্থান করতে হয়। তিনি যদি নিরাকার হন, তাহলে কি করে তা সম্ভব? (আল্লাহ কি নিরাকার -৩৫)

এছাড়া ইমাম বুখারী (রহ.) নিম্নোক্ত আয়াতের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ না করে তা'ওয়ীল করেছেন অর্থাৎ, তিনি বলেছেন–

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ اى إِلَّا مُلْكَهُ

আল্লাহর ওয়াজহ (চেহারা) ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল। [সুরা কাসাস : ৮৮]

অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্ব ছাড়া সবকিছু ধ্বংসশীল। (বুখারী কিতাবুত তাফসীর)

এর জবাবে নাসিরুদ্দিন আলবানি লিখেছেন

يا أخي! هذا لا يقوله مسلم مؤمن

প্রিয় ভাই, এমনটা কোনো মুমিন-মুসলিম বলতে পারে না। (ফতোয়ায়ে আলবানি -৫২৩)

অথচ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কোন ইমামই এ ধরণের আয়াতে শব্দের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করেননি। তারা তাফওয়ীদ অথবা তা'ওয়ীল করেছেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী-

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ - সেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত হবে।

এর ব্যাখ্যায় ইমামুল মুফাসসিরীন হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন **يوم يكشف عن شدة** (ফাতহুল বারী, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা-৫০৮) এখানে হযরত ইবন আব্বাস (রা.) কুরআনে বর্ণিত এই **ساق** শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন **شدة** (কঠোরতা) ধারা।

আল্লাহ তাআলার বাণী -

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

- আর আকাশকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি এবং তা সম্প্রসারণ করেছি।

আয়াতের মধ্যে **يدٍ** শব্দের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, **اي بقوة** (তাফসীরে তাবারী, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে দূররে মানসুর)

৩. আল্লাহ তাআলার বাণী -

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ - তার কুরসী আসমান যমীন ব্যাপৃত।

আয়াতের মধ্যে ইবন আব্বাস (রা.) **كُرْسِيُّ** শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন ইলম দ্বারা। (তাফসীরে তাবারী)

৪. আল্লাহ তাআলার বাণী-

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ - সেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত হবে।

আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, এই কাশফে সাক অর্থাৎ পদনালী খুলে যাওয়ার দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, ঐ দিন বিপদ, কষ্ট ও কাঠিন্যের দিন হবে। যেটাকে এখানে প্রচলিত অর্থে বলা হয়েছে।... তিনি আরো বলেন যে, এ বিষয়টি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে এও বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, যে সময় সকল বিষয় খুলে যাবে এবং আমলসমূহ প্রকাশিত হয়ে পড়বে। আর এটা খুলে যাওয়া হলো আখিরাত এসে পড়া এবং কর্ম প্রকাশিত হওয়া। এ রিওয়াইয়াতগুলো ইমাম ইবন জারীর (রহ.) বর্ণনা করেছেন। (তাফসীরে ইবন কাসীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা-৪০৯)

CamScanner

বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত 'আল্লাহর সিফাতসমূহের তাফওয়ীদ ও তাওয়ীল অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক চিন্তাধারা' বইটি দেখতে পারেন।

হাফিজ ইবনু তাইমিয়্যাহ ও তার অনুসারীগণ মুতাশাবিহ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে বাতিল আকিদা সাব্যস্ত করলেও কিছু আয়াতের ক্ষেত্রে তারাও শব্দের রুপক অর্থ ব্যবহার করতে বাধ্য হন। যেমন- আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

"যে ব্যক্তি এখানে (দুনিয়াতে) অন্ধ, সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।"

অন্য আয়াতে আছে-

ان الله مع الذين اتقوا আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

لا تحزن ان الله معنا তুমি ভয় পেয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।

ইত্যাদি আয়াত। এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন

الفرقان بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان

শব্দের অর্থ বুঝতে হলে ভাষার প্রচলন, বাক্যের প্রেক্ষাপট, বক্তার উদ্দেশ্য এবং শরিয়তের মৌলিক নীতিমালা সবকিছুকে সামনে রাখতে হবে। কোনো শব্দের একটি অর্থ আছে বলেই সেটিকে সর্বক্ষেত্রে সেই অর্থে সীমাবদ্ধ করা যায় না। বরং শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, বক্তার উদ্দেশ্য কী এবং সেই ব্যবহারের পেছনে কী আকিদা রয়েছে তা যাচাই করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

আমি এই গ্রন্থে মাজাযের পরিচয়, এর প্রয়োজনীয়তা, মাজাযের প্রয়োগ এবং কুরআন-হাদিসে মাজাযে আকলী-এর ব্যবহার ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শব্দের সঠিক মর্ম সহজ ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যাতে কেউ মুসলমানদের মাঝে ব্যবহৃত বহু শব্দকে অযথা শিরক, বিদআত কিংবা ভ্রান্ত আকিদার সঙ্গে যুক্ত করতে না পারে।

এক্ষেত্রে মক্কা শরীফের প্রখ্যাত আলেম, মুহাদ্দিস ও সুফি সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাভী আল মালেকী (রহ.) এর কিতাব 'মাফাহিম' থেকে কিছু উদাহরণ ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরেছি। আগ্রহী পাঠকগন আরো বিস্তারিত জানার জন্যে উক্ত কিতাবের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় পাঠ করতে পারেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআন-সুন্নাহর মর্ম যথাযথভাবে বোঝার তাওফিক দান করুন। আমিন

CamScanner

হাকীকত ও মাজায

আরবি ভাষায় হাকীকত ও মাজায একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআন হাদীস ও ইলমে শরীয়তে জ্ঞান লাভের জন্য হাকীকত মাজায সম্পর্কে অবগত হওয়া অপরিহার্য। কারণ কুরআন হাদীসে মাজায-এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। এগুলোর সঠিক প্রয়োগ এবং অর্থ সম্পর্কে অবগত না হলে তা থেকে মাসআলা বের করা অনেকটাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ কারণেই উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে খুবই গুরুত্বের সাথে এর আলোচনা করা হয়েছে। তা ছাড়া মাজায এর ব্যবহার বাক্যকে অলংকারপূর্ণ ও ফাসাহাতপূর্ণ করে। আর পবিত্র কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়ায় তা সর্বাধিক বালাগতপূর্ণ কিতাব। এজন্যই সেখানে মাজায -এর অধিক ব্যবহার রয়েছে। ইলমে বালাগাতেও মাজায এর আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে হাকীকত ও মাজাযের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি। 'মুখতাসারুল মা'আনী' গ্রন্থকার আল্লামা সা'দ উদ্দিন তাফতাযানী (রহ.) (মৃত্যুঃ ৭৯৩) হাকীকতের সংজ্ঞায় লিখেছেন-

الكلمة المستعملة فيما وضعت الكلمة له في اصطلاح التخاطب

অর্থাৎ হাকীকত হচ্ছে এমন একটি শব্দ যা তার জন্য গঠিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তিনি মাজায-এর পরিচয় দিতে গিয়ে লেখেন-

الكلمة المستعملة في غير ما وضعت الكلمة له في اصطلاح التخاطب

অর্থাৎ মাজায হচ্ছে এমন একটি শব্দ যা তার জন্য গঠিত অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ভিন্ন কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রখ্যাত উসুলবিদ 'নুরুল আনওয়ার' গ্রন্থকার বলেন-

أما الحقيقة فإسم لكل لفظ أريد به ما وضع

অর্থাৎ হাকীকত হচ্ছে এমন একটি শব্দ যা তার জন্য গঠিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

وأما المجاز فإسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما أي اسم لكل لفظ أريد به غير ما وضع له لأجل مناسبةبين المعنى الموضوع له وغير الموضوع له

অর্থাৎ মাজায হচ্ছে এমন একটি ইসম যা তার জন্য গঠিত অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ভিন্ন কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। গঠিত অর্থ এবং ব্যবহৃত অর্থের মধ্যে বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকার কারণে।

উসুলবিদগণ মাজাযকে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন। একইভাবে বালাগাত শাস্ত্রবিদগণ মাজাযকে মাজাযে মুরসাল, মাজাযে মুরাক্কাব, মাজাযে আকলি ও ইসতিআরাহ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন।

CamScanner

'মুখতাসারুল মা'আনী' গ্রন্থকার মাজায-এর উদাহরণ দিতে গিয়ে লেখেন-

১. পূর্ণ অংশ বলে আংশিক বুঝানো, যেমন কুরআনে কারীমের আয়াত- **يجعلون أصابعهم في أذانهم** অর্থাৎ, তারা তাদের আঙ্গুলসমূহ তাদের কানের মধ্যে রাখে। আলোচ্য আয়াতে **أصابعهم** (আঙ্গুলসমূহ) দ্বারা **أناملهم** (আঙ্গুলের অগ্রভাগ) বুঝানো হয়েছে। কারণ আঙ্গুল কানের ভেতর ঢুকানো সম্ভব নয়।

২. অতীতে ছিল এমন কোন অবস্থাকে বর্তমানে উল্লেখ করা। যেমন- আল্লাহ পাক বলেন- **واتوا اليتامى أموالهم** তোমরা ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পত্তি বুঝিয়ে দাও। এখানে ইয়াতিমগণ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর তাদের সম্পত্তি বুঝিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর আর কেউ ইয়াতিম থাকে না। যেহেতু তারা পূর্বে ইয়তীম ছিল, তাই সে শব্দটি মাজাযী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. ভবিষ্যতে হবে এমন অবস্থাকে বর্তমানের শব্দ উল্লেখ করা। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে **إني أرا ني أعصِرُ خَمْرًا** আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি মদ নিংড়াচ্ছি। উক্ত আয়াতে মদ নিংড়ানোর কথা বলা হলেও আসলে মদ নিংড়ানো হয় না, মদের উপকরণ নিংড়ানো হয়। এখানে । মদ নিংড়ানো দ্বারা মদের উপকরণ নিংড়ানোর অর্থ নেওয়া হয়েছে।

৪. কোন বিষয় উল্লেখ করে তার অবস্থার অর্থ গ্রহণ করা। যেমন- আল্লাহ পাকের বাণী **وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رحمة الله** আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহর রহমতের মধ্যে থাকবে। এখানে **رحمة الله** শব্দটি মাজাযী **جنة** অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. কোন বস্তুর মাধ্যম উল্লেখ করে বস্তুকে বোঝানো হয়। যেমন- পবিত্র কুরআনের আয়াত **واجْعَل لي لسان صدق في الآخرين** হে আল্লাহ। আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর। এখানে **لسان صدق** শব্দদ্বয় **ذاكر** বা যিকরকারী অর্থে মাজাযান ব্যবহৃত হয়েছে।

কুরআন -হাদীসে উল্লেখিত কিছু মাজাযের উদাহরণ-

কুরআনে পাকে আল্লাহ তা'আলা একই বিশেষনকে নিজের জন্য, জিবরাঈল (আ.) ও নেককার বান্দাহদের জন্য ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহ পাকের বাণী-

فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ

তবে জেনে রাখ, আল্লাহ, জিবরাঈল ও সৎকর্মপরায়ন মুমিনগণ তাঁর সহায়।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুসী (রহ.) লেখেন যে, এখানে 'মাওলা' শব্দটি একেকজনের ক্ষেত্রে একেক অর্থে এসেছে। সবার ক্ষেত্রে সমান অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। তিনি লেখেন-

وهو إما لفظ مولي مرادا به مع كل معنى من معانيه المناسبة أي (وجبريل) مولاه أي قرينه (وصالح المؤمنين) مولاه أي تابعه أو لفظ آخر بذلك المعنى المناسب

অনুবাদ: এখানে 'মাওলা' শব্দটি প্রত্যেকের জন্য তাদের উপযোগী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ জিবরাঈলের ক্ষেত্রে 'মাওলা' এর অর্থ হল সঙ্গী, নেককারদের ক্ষেত্রে মাওলার অর্থ হল অনুসারী। অথবা উপযোগী অন্য কোন অর্থ। (তাফসীরে রুহুল মা'আনী, সূরা তাহরীম, আয়াত: ৪)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

"আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে।"

এখানে ঈমান বৃদ্ধির কাজটি 'আয়াত সমূহের' সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে আয়াতসমূহ নিজে ঈমান বৃদ্ধি করে না; বরং এগুলো ঈমান বৃদ্ধির কারণ ও মাধ্যম। প্রকৃতপক্ষে ঈমান বৃদ্ধি করার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ তাআলার। তাই এখানে প্রকৃত কর্তার পরিবর্তে কারণ বা মাধ্যমের সঙ্গে কাজের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। এটিই মাজাযে আকলী।

আর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا

"সেই দিন, যেদিন শিশুকে বৃদ্ধ করবে।"

এখানে শিশুদের বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার কাজটি 'দিনের' সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অথচ দিন নিজে কাউকে বৃদ্ধ করে না। বরং সেই দিনটি হলো তাদের বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার সময় ও অবকাশ। প্রকৃতপক্ষে তাদের এই পরিবর্তন আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি ও হুকুমে সংঘটিত হবে। তাই এখানে কাজটির প্রকৃত কর্তার পরিবর্তে কাজ সংঘটিত হওয়ার সময়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। এটিও মাজাযে আকলী।

আল্লাহ তাআলা নূহ (আ.)-এর কওমের মূর্তিগুলোর প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন–

وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا

"এবং তারা ইয়াগূস, ইয়াউক ও নাসরকে পরিত্যাগ করেনি; অথচ তারা বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে।"

এখানে পথভ্রষ্ট করার কাজটি মূর্তিগুলোর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। অথচ মূর্তিগুলো নিজেরা কাউকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা রাখে না। তারা ছিল মানুষের পথভ্রষ্টতার মাধ্যম ও কারণ। প্রকৃতপক্ষে হেদায়েত ও গোমরাহির ক্ষমতা ও

CamScanner

কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ তাআলার। অতএব, এখানে প্রকৃত কর্তার পরিবর্তে কারণ ও মাধ্যমের দিকে কাজটি সম্বন্ধ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে ফেরাউনের বক্তব্য হিসেবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا

"হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো।"

এখানে নির্মাণের কাজটি হামানের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। অথচ হামান নিজ হাতে প্রাসাদ নির্মাণ করেনি; বরং তার নির্দেশে শ্রমিক ও নির্মাণকর্মীরা তা নির্মাণ করেছিল। অর্থাৎ হামান ছিল নির্মাণকাজের আদেশদাতা ও তত্ত্বাবধায়ক, প্রকৃত নির্মাণকারী ছিল শ্রমিকরা। সুতরাং প্রকৃত কর্তার পরিবর্তে আদেশদাতার দিকে কাজটি সম্বন্ধ করা হয়েছে। এটিও মাজাযে আকলী।

হাদিসেও এ ধরনের সম্বন্ধের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যারা হাদিসসমূহ অধ্যয়ন করেছেন এবং ইসনাদে হাকিকি ও ইসনাদে মাজাযি এর পার্থক্য সম্পর্কে অবগত, তাদের কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন কোনো একত্ববাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি যদি এ ধরনের মাজাযি সম্বন্ধ ব্যবহার করেন, তাহলে তার সঠিক আকিদাই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট । কারণ, একজন মুসলমানের মৌলিক আকিদা হলো বান্দা ও বান্দার সমস্ত কর্মের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছা ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নিজস্ব ও স্বাধীন কোনো প্রভাব নেই।

সুতরাং কোনো জীবিত ব্যক্তি কিংবা মৃত ব্যক্তিকে কোনো কাজের মাধ্যম, কারণ, সহযোগী বা মাজাযি কর্তা হিসেবে উল্লেখ করা এবং তাকে স্বাধীনভাবে প্রভাব বিস্তারকারী মনে করা এ দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

তাওহীদের বিশ্বাস হলো সৃষ্টিজগতের প্রকৃত স্রষ্টা , কর্তা ও স্বাধীন প্রভাবশালী একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আর কেউ যদি এর বিপরীতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টিকর্তা বা স্বতন্ত্র প্রভাবশালী মনে করে, তাহলে সে তাওহীদের সীমা অতিক্রম করে শিরকের মধ্যে পতিত হবে।

CamScanner

কুফর ও ঈমান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সম্বন্ধের ধরন লক্ষ্য করা জরুরী

কুফর ও ঈমান নির্ণয় করার সময় শুধু কোনো শব্দের বাহ্যিক অর্থ দেখলেই হবে না; বরং সেই শব্দ বা কাজটি কার দিকে কী ধরনের সম্বন্ধে যুক্ত করা হয়েছে, সেটিও বুঝতে হবে।

বিভিন্ন ভ্রান্ত মতের অনুসারীরা অনেক সময় কুরআন-হাদিসের কোনো একটি বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে নিজেদের মতের পক্ষে দলিল দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু তারা সেই বক্তব্যের প্রসঙ্গ উদ্দেশ্য ও প্রকৃত মর্ম বিবেচনা করেনি। পাশাপাশি কুরআন-হাদিসের অন্যান্য বক্তব্যের সঙ্গে সেটিকে মিলিয়ে দেখেনি। ফলে একটি দলিলকে কেন্দ্র করে এমন মত গ্রহণ করেছে, যা অন্যান্য দলিলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়।

এর একটি উদাহরণ হলো কুরআন সৃষ্ট কি না?

যারা কুরআনকে সৃষ্ট বলে মনে করেছে তারা আল্লাহ তা'আলার এই আয়াতকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছে।

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

অর্থ: "আমি একে বানিয়েছি আরবী কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

তারা جَعَلْنَاهُ (আমরা এটিকে বানিয়েছি)–এই শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধরে নিয়েছে যে, কুরআন যেহেতু আল্লাহ বানিয়েছেন, তাই কুরআনও সৃষ্ট।

কিন্তু এখানে جعل শব্দের অর্থ ও প্রসঙ্গ বিবেচনা করা জরুরি। আয়াতের উদ্দেশ্য কুরআনের অস্তিত্ব সৃষ্টি করা নয়; বরং তাকে আরবি ভাষায় প্রকাশিত কুরআনরূপে নির্ধারণ বা প্রকাশ করা।

কাদরিয়্যারা (তাকদির অস্বীকার করার কারণে তাদের কাদরিয়্যা বলা হয়। তাদের ভ্রান্ত দাবি হলো, মানুষ আপন কর্মের স্রষ্টা) মানুষের কাজকে মানুষের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে এমন আয়াতকে তাদের মতের দলিল বানিয়েছে। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী

بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

"তোমাদের হাত যা অর্জন করেছে, তার কারণে।"

অন্য আয়াতে আছে–

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"তোমরা যা করতে, তার কারণে।"

তারা বলেছে, যেহেতু মানুষের কাজকে মানুষের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, তাই মানুষই তার কাজের স্বাধীন স্রষ্টা ও প্রকৃত কর্তা।

CamScanner

কিন্তু তারা এ কথাও বিবেচনা করেনি যে, কোনো কাজকে বান্দার দিকে সম্বন্ধ করা মানেই এই নয় যে, বান্দা সেই কাজের প্রকৃত স্রষ্টা। বান্দার কাজ তার নিজের কর্ম ও অর্জন হিসেবে তার দিকে সম্বন্ধ করা হতে পারে, অথচ সেই কাজের অস্তিত্ব সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ।

অন্যদিকে জাবরিয়্যারা (তারা মানুষকে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম মনে করে। তাদের মতে বান্দার সকল কাজ আল্লাহ তা'আলার দ্বারা সংঘটিত হয়। তাই বান্দা ভালো কর্মের জন্য প্রতিদান ও প্রশংসা এবং মন্দ কর্মের জন্য তিরস্কার ও শাস্তির যোগ্য নয়) এমন আয়াতকে দলিল বানিয়েছে, যেখানে মানুষের কাজকে আল্লাহর সৃষ্টি বলা হয়েছে। যেমন–

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

অর্থ: "আল্লাহ তোমাদের এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি করেছেন।"

আর–

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى

অর্থ: "তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করোনি; বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন।"

তারা এগুলো থেকে বুঝেছে যে, মানুষের কোনো বাস্তব কর্মক্ষমতা নেই; মানুষের কাজও আল্লাহর কাজের মতোই।

কিন্তু এখানেও সম্বন্ধের ধরণ বুঝতে হবে। মানুষ কাজটি করে এই অর্থে কাজটি মানুষের দিকে সম্বন্ধ করা হয়; আর কাজটির অস্তিত্ব, ক্ষমতা ও সৃষ্টি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই অর্থে কাজটি আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়।

এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝলে জানা যায় যে, কাদরিয়্যাহ মতাবলম্বীরা ছাড়া সমগ্র উম্মত একমত যে, বান্দার কাজ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি।

বান্দা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, দান করে, আবার কেউ গুনাহ করে অর্থাৎ বান্দা কাজ করে। কিন্তু সেই কাজ করার ক্ষমতা, শরীর, ইচ্ছা ও কাজটি সংঘটিত হওয়ার সামগ্রিক ব্যবস্থা আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন।

তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

"আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি করেছেন।" অর্থাৎ কাজটি বান্দার মাধ্যমে সংঘটিত হলেও সৃষ্টির দিক থেকে তা আল্লাহর সৃষ্টি।

তাহলে বান্দার কাজকে তার নিজের কাজ বলা হয় কেন? কারণ এখানে সম্পর্কের ধরন আলাদা। কাজটি আল্লাহর দিকে সৃষ্টি করার দিক থেকে সম্বন্ধিত,

আর বান্দার দিকে কাজটি করা ও অর্জন করার দিক থেকে সম্বন্ধিত। এটিই কাস্‌ব (كَسْب) বা অর্জন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

"সে যা অর্জন করেছে, তা তারই জন্য; আর সে যা অর্জন করেছে (অন্যায়ভাবে), তা তার উপরই বর্তাবে।"

অর্থাৎ বান্দা যেহেতু নিজের ইচ্ছা ও নির্বাচনের মাধ্যমে কাজটি করেছে, তাই কাজের সওয়াব-গুনাহের দায়িত্ব তার উপর।

এ থেকে বোঝা যায় যে, ক্ষমতার সঙ্গে কোনো কর্মের সম্পর্ক শুধু সেই ক্ষমতার মাধ্যমে কর্মটি অস্তিত্ব লাভ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বান্দাদের কাজ তাদের দিকে (কাসবের) মাধ্যমে সম্বন্ধ করা হয়, সৃষ্টির মাধ্যমে নয়। কারণ কাজের প্রকৃত স্রষ্টা , নির্ধারক এবং ইচ্ছাকারী হলেন আল্লাহ তাআলা।

এখানে আপত্তি করা যাবে না যে, "আল্লাহ কীভাবে এমন কোনো কাজের ইচ্ছা করেন, যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন?"

এর উত্তর হলো: আল্লাহর আদেশ ও তাঁর ইচ্ছা এক বিষয় নয়।

এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষকে ঈমানের আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের ঈমানের তিনি ইরাদা করেননি। আল্লাহ বলেন:

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

"তুমি যতই আগ্রহী হও না কেন, অধিকাংশ মানুষ ঈমানদার হবে না।"

অতএব, বান্দার দিকে তাদের কাজের সম্বন্ধ হলো মুসাব্বাবকে সবব বা মাধ্যমের দিকে সম্বন্ধ করার মতো। এতে কোনো বিরোধ নেই। কারণ, সকল সববের স্রষ্টা আল্লাহই। তিনিই মাধ্যম সৃষ্টি করেছেন এবং সেই মাধ্যমের মধ্যে মাধ্যম হওয়ার বৈশিষ্ট্যও সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যদি কোনো বস্তুর মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না করতেন, তাহলে সেটি মাধ্যম হওয়ার উপযুক্ত হতো না। সেই মাধ্যম জড়বস্তু হোক যেমন জড় পদার্থ, আকাশমণ্ডলী, বৃষ্টি ও আগুন অথবা বুদ্ধিমান কোনো সত্ত্বা হোক যেমন ফেরেশতা, মানুষ ইত্যাদি। সব ক্ষেত্রে মূলনীতি একই।

CamScanner

শব্দের সম্বন্ধ পরিবর্তনের কারণে অর্থের পার্থক্য

যদি প্রশ্ন করা হয়, একটি কাজকে একই সময়ে দুই ব্যক্তির কর্তা হিসেবে কীভাবে সম্বন্ধ করা সম্ভব? কারণ একই কাজের ওপর যদি দুইজনের সমান ও স্বাধীন প্রভাব থাকে, তাহলে তা একসঙ্গে হওয়া অসম্ভব। আমরা বলব: হ্যাঁ, কথা ঠিক। কিন্তু এই আপত্তি তখনই হবে, যখন দুই জায়গায় 'কর্তা' শব্দ দ্বারা একই অর্থ বোঝানো হবে। কিন্তু যদি একই 'কর্তা' শব্দ দ্বারা দুই ক্ষেত্রে দুই ধরনের অর্থ বোঝানো হয়, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হলেও তার অর্থ এক নয়। এটি মুশতারাক শব্দ অথবা হাকিকত ও মাজায-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুপরিচিত।

যেমন বলা হয়:

قَتَلَ الْأَمِيرُ فُلَانًا

"আমীর অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন।"

আবার বলা হয়:

قَتَلَهُ السَّيَّافُ

"জল্লাদ তাকে হত্যা করেছে।"

এখানে আমীর ও জল্লাদ উভয়ের ক্ষেত্রেই 'হত্যা করা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দুজনের হত্যার ধরন এক নয়। আমীরের ক্ষেত্রে হত্যার অর্থ হলো তিনি হত্যার আদেশ দিয়েছেন এবং তা কার্যকর করিয়েছেন। আর জল্লাদের ক্ষেত্রে হত্যার অর্থ হলো সে নিজ হাতে সরাসরি হত্যা করেছে।

সুতরাং একই 'হত্যা' শব্দ ব্যবহৃত হলেও দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার সম্বন্ধ ও অর্থ আলাদা।

আমরা যখন বলি: "আল্লাহ তাআলা কর্তা।" তখন এর অর্থ হলো আল্লাহ তাআলা কাজটির স্রষ্টা, উদ্ভাবনকারী এবং অস্তিত্বদানকারী।

আর যখন বলি: "বান্দাও কর্তা।" তখন এর অর্থ হলো বান্দা এমন একটি মহল যার মধ্যে আল্লাহ তাআলা প্রথমে ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন, কাজের ক্ষমতা সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর সেই ক্ষমতার মাধ্যমে কাজটি সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ বান্দা কাজটি সৃষ্টি করে না, বরং তার মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টি করা ইচ্ছা ও ক্ষমতার মাধ্যমে কাজটি প্রকাশ পায়। ক্ষমতার সঙ্গে ইচ্ছার সম্পর্ক এবং ক্ষমতার সঙ্গে কাজের সম্পর্ক ইল্লাত ও মা'লুলের সম্পর্ক। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির প্রকৃত স্রষ্টা, আর বান্দা সেই কাজের মহল ও কাসিব তথা অর্জনকারী। যদি সেই মহলটি জ্ঞানবান সত্তা হয়, তাহলে তার সঙ্গে কাজের সম্পর্ক হবে তার ইচ্ছা ও নির্বাচনের মাধ্যমে কাজ অর্জন করার সম্পর্ক। আর যদি মহলটি জ্ঞানবান সত্ত্বা

না হয়, তাহলে তার সঙ্গে কাজের সম্পর্ক হবে সববসমূহের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে মুসাব্বাব সংঘটিত হওয়ার সম্পর্ক। তাই একই ব্যক্তিকে ভিন্ন বিবেচনায় কর্তা বলা যায় তথা কোনো কাজের সঙ্গে যার কোনো না কোনোভাবে সম্পর্ক রয়েছে, সেই সম্পর্কের বিবেচনায় তাকে 'কর্তা' বলা যেতে পারে। তবে কর্তৃত্বের ধরন এক হবে না।

যেমন- এক দিক থেকে জল্লাদ হত্যাকারী, অন্য দিক থেকে আমীরও হত্যাকারী। কারণ হত্যার সঙ্গে দুজনেরই সম্পর্ক আছে। কিন্তু জল্লাদের সম্পর্ক সরাসরি, আর আমীরের সম্পর্ক আদেশ ও নির্দেশের মাধ্যমে। ঠিক একইভাবে কোনো কাজকে দুই ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত বলা যেতে পারে; তবে দুই ক্ষমতার সঙ্গে সেই কাজের সম্পর্কের ধরণ আলাদা। এ ধরণের সম্পর্ক বৈধ হওয়ার প্রমাণ হলো–আল্লাহ তা'আলা একই কাজকে কখনো ফেরেশতাদের দিকে, কখনো বান্দাদের দিকে, আবার কখনো নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন।

প্রাণ কবজ করা

আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ

"বলুন, তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ কবজ করেন।"

এখানে প্রাণ কবজ করার কাজ মৃত্যুর ফেরেশতার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে।

আবার বলেন:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا

"আল্লাহ মৃত্যুর সময় প্রাণসমূহ কবজ করেন।"

এখানে একই প্রাণ কবজ করার কাজ আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। দুই আয়াতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ মৃত্যুর ফেরেশতা আল্লাহর নির্দেশে প্রাণ কবজ করেন, আর আল্লাহ তাআলা হলেন প্রকৃত স্রষ্টা ও সর্বময় কর্তা।

চাষ করা ও শস্য উৎপন্ন করা

আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ

"তোমরা যে চাষ কর, তা কি তোমরা লক্ষ্য করেছ?"

এখানে চাষ করার কাজ মানুষের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে।

তারপর বলেন:

أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

"তোমরাই কি তা উৎপন্ন কর, নাকি আমিই উৎপন্নকারী?"

CamScanner

এখানে শস্য উৎপন্ন করার কাজ আল্লাহ নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। অর্থাৎ মানুষ জমি চাষ করে, বীজ বপন করে কিন্তু বীজকে অঙ্কুরিত করা, গাছ সৃষ্টি করা এবং শস্য উৎপন্ন করা আল্লাহর কাজ।

কুরআন পাঠ করা

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

"অতঃপর যখন আমি তা পাঠ করি, তখন তুমি সে পাঠের অনুসরণ করো।"

এখানে কুরআন পাঠের কাজ আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কুরআন পৌঁছে দেওয়ার সময় জিবরাঈল (আ.) তা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ

"তোমরা তাদেরকে হত্যা করোনি; বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন।"

আরও বলেন:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى

"তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করোনি; বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন।"

এখানে প্রথম আয়াতে একদিকে সাহাবায়ে কেরামের হত্যা করা অস্বীকার করে সেই হত্যাকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিক্ষেপ করাকে অস্বীকার করে নিক্ষেপকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বাস্তবে সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের হত্যা করেননি, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তবে কঙ্কর নিক্ষেপ করেননি। বরং এর অর্থ হলো সাহাবারা যে অর্থে হত্যা করেছিলেন, আল্লাহ সেই অর্থে হত্যা করেননি; আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অর্থে নিক্ষেপ করেছিলেন, আল্লাহ সেই অর্থে নিক্ষেপ করেননি। অর্থাৎ এখানে দুই ধরনের অর্থ ও সম্পর্ক রয়েছে। বান্দাদের হত্যা ও নিক্ষেপ কাসব, ইচ্ছা ও বাহ্যিকভাবে কাজ করার দিক থেকে। আল্লাহর হত্যা ও নিক্ষেপ সৃষ্টি, নির্ধারণ, শক্তি প্রদান ও কাজকে অস্তিত্বে আনার দিক থেকে। তাই একই কাজ উভয়ের দিকেই সম্বন্ধ করা হলেও কোনো বিরোধ হয়

CamScanner

না। কখনো একই কাজ আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের দিকেই একই বাক্যে সম্বন্ধ করা হয়।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ

"যদি তারা তাতে সন্তুষ্ট হতো, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের দিয়েছেন এবং বলত, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে আমাদের দেবেন এবং তাঁর রাসূলও দেবেন।" এখানে দেওয়ার কাজ আল্লাহর দিকে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দিকেও সম্বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু দুজনের ক্ষেত্রে 'দেওয়া' একই অর্থে নয়। আল্লাহ দেন প্রকৃত মালিক ও দাতা হিসেবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর অনুমতি ও নির্দেশ অনুযায়ী পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে।

অতএব, কাজ একই হলেও সম্পর্কের ধরণ আলাদা। বিষয়টি ভালোভাবে বুঝলে বোঝা যায় যে, একটি কাজ বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে সম্বন্ধ করা যেতে পারে। এতে কোনো বিরোধ নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا

"সে রবের অনুমতিতে প্রত্যেক সময় ফল প্রদান করে।"

এখানে ফল দেওয়ার কাজ গাছের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু গাছ নিজে স্বাধীনভাবে ফল দিতে পারে না। গাছের মধ্যে ফল সৃষ্টি করার ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন এবং আল্লাহর হুকুমেই গাছ থেকে ফল প্রকাশ পায়।

তাই বলা যায়– গাছ ফল দেয় বাহ্যিক ও মাধ্যমের দিক থেকে। আল্লাহ ফল দেন প্রকৃত সৃষ্টি ও অস্তিত্বদানের দিক থেকে।

কখন সম্বন্ধ (ইদাফাত) করা কুফর হয়

কোনো কাজের সঙ্গে কোনো ইদাফাত থাকলেই তাকে সেই কাজের প্রকৃত কর্তা মনে করা যাবে না। কারণ, মাধ্যমকে দুইভাবে ভাগ করা যায়।

এক. মাধ্যমকে শুধু একটি উপায়, কারণ বা নিদর্শন মনে করা।

দুই. মাধ্যমকে স্বাধীনভাবে প্রভাবশালী, পরিচালনাকারী ও সৃষ্টিকারী মনে করা।

প্রথমটি কুফর নয়। কিন্তু দ্বিতীয়টি কুফর ও শিরকের দিকে নিয়ে যায়।

মূসা (আ.)-এর জবাবে কারূন বলেছিল: **إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي**

CamScanner

"আমি তো আমার নিজের জ্ঞান ও যোগ্যতার কারণেই এটি লাভ করেছি।"
এখানে কারূন আল্লাহর দেওয়া সম্পদকে নিজের জ্ঞান ও যোগ্যতার দিকে এমনভাবে সম্বন্ধ করেছে, যেন সে নিজেই এর প্রকৃত অধিকারী ও প্রভাবশালী। অর্থাৎ সে আল্লাহর নিয়ামতকে শুধু একটি মাধ্যমের দিকে সম্বন্ধ করেনি; বরং নিজের যোগ্যতাকেই মূল কারণ ও প্রকৃত প্রভাবশালী হিসেবে দেখেছে।
হাদিসে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ

"আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমানদার হয়ে এবং কেউ আমার প্রতি কাফির হয়ে সকালে উপনীত হয়েছে।"
যে ব্যক্তি বলে:

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ

"আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে আমাদের উপর বৃষ্টি হয়েছে।" সে আল্লাহর প্রতি ঈমানদার।
আর যে ব্যক্তি বলে:

مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا

"অমুক নক্ষত্রের কারণে আমাদের ওপর বৃষ্টি হয়েছে।" সে আল্লাহর প্রতি কুফর করেছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এখানে কুফরের কারণ হলো সে যদি বিশ্বাস করে যে নক্ষত্র নিজেই বৃষ্টি ঘটায়, পরিচালনা করে এবং সৃষ্টি করে, তাহলে সে আল্লাহর সঙ্গে নক্ষত্রকে শরিক করল।
ইমাম নববী (রহ.) বলেন, "অমুক নক্ষত্রের কারণে আমাদের বৃষ্টি হয়েছে" এ কথা বলার ব্যাপারে আলেমদের দুটি মত রয়েছে।
প্রথম মত: এটি আল্লাহর প্রতি কুফর, যা ঈমানের মূল ভিত্তি নষ্ট করে এবং মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় যদি তার বিশ্বাস হয় যে নক্ষত্র নিজেই বৃষ্টির কর্তা, পরিচালক ও সৃষ্টিকারী।
জাহেলি যুগের কিছু মানুষ এমন বিশ্বাস রাখত। তারা মনে করত, নক্ষত্রের নিজস্ব ক্ষমতার কারণে বৃষ্টি হয়।
এ ধরনের বিশ্বাস যে কুফর, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অধিকাংশ আলেম, বিশেষত ইমাম শাফেয়ী (রহ.), এই মত গ্রহণ করেছেন।
দ্বিতীয় মত: কেউ যদি বলে- "অমুক নক্ষত্রের উদিত হওয়ার সময় আমাদের বৃষ্টি হয়েছে।" কিন্তু তার বিশ্বাস থাকে যে বৃষ্টি একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে ও তাঁর রহমতে হয়েছে, আর নক্ষত্রটি শুধু বৃষ্টির সময়ের একটি নিদর্শন বা এমন একটি বিষয়, যার সঙ্গে সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী বৃষ্টির সম্পর্ক দেখা যায়–তাহলে সে কাফির হবে না।

তার কথার অর্থ হবে "অমুক সময় আমাদের বৃষ্টি হয়েছে।"

তবে এ ধরনের কথা বলা মাকরূহে তানযিহি কি না–এ ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ রয়েছে।

কেউ কেউ এটিকে এমন মাকরূহে তানযিহি বলেছেন, যাতে গুনাহ নেই। কারণ এ ধরনের বাক্যে কুফর ও কুফর নয় উভয় অর্থের সম্ভাবনা থাকে। ফলে বক্তার ব্যাপারে মানুষের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে।

এ ছাড়া এটি জাহেলি যুগের লোকদের একটি প্রচলিত কথা ও রীতি ছিল।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা: নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা

আরেকদল আলেম বলেছেন। এখানে 'কুফর' দ্বারা ঈমানের বিপরীত কুফর নয়; বরং আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা বোঝানো হয়েছে।

এর সমর্থনে অন্য হাদিসে এসেছে:

أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَكَافِرٌ

"মানুষের মধ্যে কেউ কৃতজ্ঞ হয়ে এবং কেউ অকৃতজ্ঞ হয়ে সকালে উপনীত হয়েছে।"

আরেক বর্ণনায় এসেছে:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ

"আল্লাহ আকাশ থেকে যে কোনো বরকত নাজিল করেন, মানুষের একটি দল তার কারণে অকৃতজ্ঞ হয়ে সকালে উপনীত হয়।"

অতএব এখানে 'কুফর' বলতে নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতাও বোঝানো হতে পারে।

মূলকথা: আলেমদের বক্তব্যের সারমর্ম হলো কোনো ব্যক্তি কোনো কাজকে ওয়াসেতা বা মাধ্যমের দিকে সম্বন্ধ করলেই সে কাফির হয়ে যায় না। বরং সে তখনই কাফির হবে, যখন তার বিশ্বাস হবে যে, ওই মাধ্যমই কাজটির প্রকৃত কর্তা, স্বাধীন প্রভাবকারী, পরিচালক ও সৃষ্টিকারী।

পক্ষান্তরে, যদি সে মাধ্যমকে এই অর্থে না দেখে; বরং তাকে কেবল নিদর্শন, সময়, স্থান, উপায় বা কারণ হিসেবে বিবেচনা করে এবং বিশ্বাস রাখে যে, এর পেছনে প্রকৃত কর্তা ও প্রভাবকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা তাহলে তার এ সম্বন্ধকরণ কুফর নয়।বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাধ্যমকে বিবেচনা করা প্রশংসনীয় ও কাম্য।

যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ اسدى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ

CamScanner

"কেউ তোমাদের প্রতি কোনো উপকার করলে তাকে তার প্রতিদান দাও। যদি তা করতে সক্ষম না হও, তাহলে তার জন্য দোয়া করতে থাকো, যতক্ষণ না তোমরা মনে কর যে, তোমরা তার প্রতিদান দিয়েছ।"

এখানে উপকারকারী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তার উপকারের প্রতিদান দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে নিয়ামত ও উপকারের দাতা আল্লাহ তাআলাই। সেই ব্যক্তিকে উপকারের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহকে অস্বীকার করার অর্থ নয়।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ

"যে মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।"

সুতরাং বুঝা গেল, ওয়াসীলাকে স্বীকার করা এবং ওসীলা বা ওয়াসেতাকে স্বাধীন কর্তা মনে করা এক কথা নয়। একজন মানুষ কোনো ব্যক্তির উপকারকে স্বীকার করতে পারে, তাকে উপকারের মাধ্যম বলতে পারে এবং তার কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করতে পারে; কিন্তু একই সঙ্গে তার অন্তরে এই বিশ্বাস থাকতে পারে যে, প্রকৃত দাতা ও উপকারকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন স্থানে তাঁর বান্দাদের কাজের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের সেই কাজের উপর সওয়াবও দিয়েছেন। অথচ তিনিই তাদের কাজের ইচ্ছা ও সেই কাজ করার ক্ষমতার স্রষ্টা ।

আল্লাহ তাআলা বলেন– وَنِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

"সে কতই না উত্তম বান্দা! নিশ্চয়ই সে বারবার আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"

আরও বলেন– لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

"যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং তারও অধিক।"

আরও বলেন–

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

"নিশ্চয়ই সে সফল হয়েছে, যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে।"

অতএব, যখন বিষয়টি পরিষ্কার হলো যে, একটি কাজ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধ করা হতে পারে, তখন সঠিকভাবে বুঝলে এসব বক্তব্যের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না।

কারণ, অর্থের পরিধি কেবল শব্দের বাহ্যিক অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের অন্তরের উপলব্ধি ও উদ্দেশ্যের পরিধিও শুধু লিখিত শব্দের চেয়ে অনেক বিস্তৃত।

CamScanner

তাই যদি আমরা কেবল শব্দের আক্ষরিক অর্থ আঁকড়ে ধরি এবং মাজায, প্রসঙ্গ, উদ্দেশ্য ও সম্বন্ধের ধরন বিবেচনা না করি, তাহলে কুরআন-হাদিসের বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় করা কিংবা একটির সঙ্গে অন্যটির পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।

আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ

"হে আমার রব! নিশ্চয়ই এগুলো বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে।"

এখানে পথভ্রষ্ট করার কাজটি মূর্তিগুলোর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে।

তাহলে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর সঙ্গে মূর্তিগুলোকে শরিক করেছিলেন? অবশ্যই না। কারণ তিনি তো নিজেই বলেছিলেন–

أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

"তোমরা কি এমন বস্তুর ইবাদত কর, যা তোমরা নিজেরাই খোদাই কর? অথচ আল্লাহ তোমাদের এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি করেছেন।"

সুতরাং এখানে দুই ধরনের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। মূর্তিগুলোকে মানুষের পথভ্রষ্টতার কারণ বা মাধ্যম হিসেবে সম্বন্ধ করা হয়েছে; কিন্তু প্রকৃত অর্থে হেদায়েত ও গোমরাহির সৃষ্টিকর্তা ও স্বাধীন প্রভাবকারী আল্লাহ তাআলাই।

সুতরাং এ বিষয়ের সার্বিক মূলনীতি হলো- যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে অন্য কাউকে সৃষ্টি ও স্বাধীন প্রভাবের ক্ষেত্রে শরিক করে, সে মুশরিক। সে যাকে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করেছে, তা জড়বস্তু হোক, মানুষ হোক বা নবী হন কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টিই হোক–এ ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই।

অন্যদিকে, কেউ যদি কোনো বস্তুকে কারণ বা মাধ্যম হিসেবে বিশ্বাস করে– অর্থাৎ মনে করে যে, আল্লাহ তাআলা কোনো ফল লাভের জন্য এটিকে একটি মাধ্যম বানিয়েছেন; কিন্তু প্রকৃত কর্তা, সৃষ্টিকারী ও প্রভাবশালী একমাত্র আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর কোনো শরিক নেই–তাহলে সে মুমিন।

এমনকি কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়কে ভুল করে কারণ মনে করলেও শুধু এ কারণে সে কাফির হবে না। কারণ তার ভুল হয়েছে সবব নির্ধারণের ক্ষেত্রে, প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা– এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তার ভুলটি হয়েছে 'সবাব' কারণ বা মাধ্যম নির্ধারণের ক্ষেত্রে; 'মুসাব্বাব'– কার্যকে অস্তিত্বদানকারী প্রকৃত কর্তা সম্পর্কে নয়।

আল্লাহ তাআলার যেসব সিফাত বান্দার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হাদিস শরিফে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলো ব্যতীত অন্যান্য এমন সিফাত, যেগুলো বান্দার

CamScanner

ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা শরিয়তসম্মত, সেগুলো কোনো বান্দার জন্য ব্যবহার করা দূষনীয় নয়।

কিন্তু বান্দার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা বৈধ–এমন কোনো সিফাত কারও নাম বা পরিচয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলে কোনো কোনো ব্যক্তি তা নিয়ে শিরকের ফতোয়া দিয়ে থাকেন। কোনো শব্দ আল্লাহ তা'আলার জন্য ব্যবহৃত হলেই তা বান্দার জন্য ব্যবহার করা শিরক হয়ে যায়– এমন নীতি সঠিক নয়। বরং দেখতে হবে, শব্দটি কোন অর্থে, কী উদ্দেশ্যে এবং কী ধরনের সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, আলবানী–যাকে ওয়াহাবী মতাদর্শের একজন প্রসিদ্ধ আলেম হিসেবে গণ্য করা হয়–তাঁর নাম 'নাসিরুদ্দীন' (ناصر الدين)। এর অর্থ হলো–'দ্বীনের সাহায্যকারী'। অথচ প্রকৃত ও স্বাধীন সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তা সত্ত্বেও তাঁর নামের মধ্যে 'নাসির' শব্দ ব্যবহৃত হওয়াকে শিরক বলা হয় না। কারণ এখানে 'নাসির' দ্বারা আল্লাহর মতো স্বাধীন ও প্রকৃত সাহায্যকারী বোঝানো হয়নি; বরং বান্দার সাধ্য ও সামর্থ্যের পরিসরে দ্বীনের সাহায্যকারী বোঝানো হয়েছে।

একইভাবে, আল্লাহ তাআলার একটি সিফাত হলো 'মালিক' (مَلِك)– অর্থাৎ বাদশাহ বা শাসক। কিন্তু সৌদি আরবের বাদশাহদেরও 'মালিক' বলে সম্বোধন করা হয়। যেমন বলা হয়–মালিক ফাহাদ, মালিক আব্দুল্লাহ, মালিক সালমান। এখানে তাঁদের 'মালিক' বলা দ্বারা আল্লাহ তাআলার মতো সর্বময়, স্বাধীন ও প্রকৃত মালিকানা বোঝানো হয় না; বরং পার্থিব রাষ্ট্রের শাসক বা বাদশাহ বোঝানো হয়। অতএব, একই শব্দ আল্লাহর জন্য এবং বান্দার জন্য ব্যবহৃত হলেও অর্থ ও সম্বন্ধ এক নয়।

একইভাবে, অল্প বয়সী কোনো ব্যক্তিকেও তারা 'শায়খ' বলে সম্বোধন করেন অথচ 'শায়খ' শব্দটি সাধারণত যৌবন পরবর্তী সময়কে বলা হয়। ফলে কোনো শব্দ আল্লাহ তাআলার জন্য ব্যবহৃত হওয়ার কারণে সেটি বান্দার জন্য ব্যবহার করলেই শিরক হয়ে যাবে–এমন ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়।

মূল বিষয় হলো, শব্দের শুধু বাহ্যিক মিল দেখলেই হুকুম দেওয়া যাবে না; বরং শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কী উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে এবং আল্লাহর সিফাত ও বান্দার গুণের মধ্যে কী ধরণের পার্থক্য রয়েছে– এসব বিবেচনা করতে হবে।

CamScanner

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামের আগে 'সাইয়্যিদুনা' শব্দ ব্যবহারের বিধান

সালাফী লা-মাযহাবীরা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামের আগে 'সাইয়্যিদুনা' শব্দ ব্যবহার করাকে নাজায়িয এমনকি শিরক পর্যন্ত বলে থাকেন। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে অসংখ্য হাদীসে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের অনেককে স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সাইয়্যিদ' বলেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা যাকারিয়া কান্দুলভী সাহেবের 'ফাজায়েলে দুরূদ শরীফ' কিতাবের সংশ্লিষ্ট অংশটি তুলে ধরছি।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামের শুরুতে 'সাইয়্যিদুনা' শব্দটি যোগ করা মুস্তাহাব। দুররুল-মুখতার গ্রন্থে লেখা আছে যে, 'সাইয়্যিদুনা' যোগ করা মুস্তাহাব, কারণ বাস্তবে আছে এমন কোনো বিষয় নামের সাথে বাড়ানো হচ্ছে শিষ্টাচার, যেমনটি রামলী শাফি'ঈ বলেছেন।

অর্থাৎ, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'সাইয়্যিদ' হওয়া একটি বাস্তব বিষয়, সুতরাং তা বৃদ্ধি করায় কোনো সমস্যা নেই, বরং এটি একটি সৌজন্যতা, কিন্তু কিছু লোক একে নিষেধ করে। সম্ভবত, তারা আবু দাউদ শরীফের একটি হাদিস সম্পর্কে ভুল করে। আবু দাউদ শরীফে সাহাবী হযরত আবু মুতারিফ থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলাম। আমরা নবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি আমাদের 'সায়্যিদ'।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সাইয়্যিদুল্লাহ," অর্থাৎ প্রকৃত 'সায়্যিদ' হলেন আল্লাহ। এবং এই মহৎ উক্তিটি সম্পূর্ণ সঠিক। অবশ্যই, প্রকৃত 'সায়্যিদ' এবং পরিপূর্ণ 'সায়্যিদ' একমাত্র আল্লাহরই, কিন্তু এর মানে এই নয় যে নবীর নামে 'সাইয়্যিদুনা' উপাধি বৃদ্ধি করা জায়েয নয়। বিশেষ করে যখন স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যেমনটি মিশকাত শরীফে বুখারী ও মুসলিমের বরাতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- **انا سيد الناس يوم القيامة** "কেয়ামতের দিন আমিই মানুষের 'সায়্যিদ' তথা সর্দার হব।" এবং দ্বিতীয় হাদিস: মুসলিম শরীফ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- **انا سيد ولد ادم يوم القيامة** "কিয়ামতের দিন আমিই মানব-সন্তানের 'সায়্যিদ' হব।" এছাড়াও, তিরমিযী শরীফের বর্ণনা অনুসারে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই উক্তিটি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর হাদিস

CamScanner

থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে: انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر-
"কেয়ামতের দিন আমিই আদম সন্তানের 'সায়্যিদ' হব এবং এতে কোনো অহংকার নেই।"
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই পবিত্র বাণীর অর্থ, যা আবু দাউদ শরীফের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তা হলো হকিকী অর্থে 'সাইয়্যিদ', আর এই হাদীসে রূপক অর্থে 'সাইয়্যিদ' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বুখারী শরীফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন: "দরিদ্র ঐ ব্যক্তি নয় যাকে এক বা দুজন লোক অন্ন দান করে, বরং দরিদ্র সে-ই যার সামর্থ্য নেই অথচ সে মানুষের কাছে চায়ও না।"

অনুরূপভাবে, মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা কাকে কুস্তিগীর মনে করো (অর্থাৎ, যে অন্য ব্যক্তিকে বশীভূত করে)?" সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, এমন ব্যক্তিকে আমরা মনে করি যাকে অন্য কেউ বশীভূত করতে পারে না?" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এ কুস্তিগীর নয়, বরং কুস্তিগীর হলো সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে।"

একই পবিত্র হাদিসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই প্রশ্নটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা সন্তানহীন বলতে কোন ব্যক্তিকে বুঝো?" সাহাবীগণ বললেন, "যার কোনো সন্তান নেই।" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এ সন্তানহীন নয়, বরং সন্তানহীন ব্যক্তি হলো সে, যে তার কোনো নাবালক সন্তানকে পরকালের জন্য ধনসম্পদ বানায়নি (অর্থাৎ, তার কোনো নিষ্পাপ সন্তান মারা যায়নি)।"
এখন এটা স্পষ্ট যে, একজন দরিদ্র ভিক্ষুককে মিসকীন বলা জায়েজ নয়, এটা কেউই বলেননি। একইভাবে, একজন শক্তিশালী লোক, যে মানুষকে কুস্তিতে পরাজিত করে, কিন্তু নিজের ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তাকেও কুস্তিগীরই বলা হয়। একইভাবে, আবু দাউদ শরীফে এমন একজন সাহাবীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিঠ মুবারকে নবুয়তের সীলমোহর দেখে আরয করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনার পীঠ মুবারক আমাকে দেখান। আমি এর চিকিৎসা করব, কারণ আমি একজন চিকিৎসক। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

CamScanner

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "চিকিৎসক হলেন আল্লাহ তাআলা, যিনি তাকে (চিকিৎসক) সৃষ্টি করেছেন।" (কাহিনীর শেষ পর্যন্ত)
এখন এই পবিত্র হাদিস থেকে কেউ কি চিকিৎসকদের "চিকিৎসক" বলতে নিষেধ করবেন? বরং, 'মাজমা' গ্রন্থকার বলেছেন যে "চিকিৎসক" আল্লাহর নামগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনিভাবে, হাদিস শরীফে প্রচুর পরিমান উদাহরণ রয়েছে যাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসকল ক্ষেত্রে পূর্ণতার বিবেচনায় নিষেধ করেছেন, বাস্তবে তা নিষিদ্ধ নয়।

আল্লামা সাখাভি বলেন যে, 'কামুস' গ্রন্থকার আল্লামা মাজদুদ্দীন লিখেছেন, যার সারমর্ম হলো, অনেক লোক **اللهم صل علي سيدنا محمد** (হে আল্লাহ, আমাদের সাইয়্যিদ মুহাম্মদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।) বলে থাকেন এবং এ নিয়ে একটি বিতর্ক রয়েছে। এটা স্পষ্ট যে নামাযে এটা না বলা উচিত।
(নোট: নামাযে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামের আগে 'সায়্যিদুনা' বলা মুস্তাহাব। 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থকার বলেন-
وندب السيادة، لان زيادة الاخبار بالواقع عين سلوك الادب، فهو أفضل من تركه، ذكره الرملي الشافعي
সম্মানসূচক উপাধি 'সাইয়িদ'-এর ব্যবহার মুস্তাহাব; কারণ তথ্য উপস্থাপনের সময় বাস্তবতাকে উল্লেখ করা যথাযথ শিষ্টাচারের পরিচায়ক এবং এটি বর্জন করার চেয়ে শ্রেয়–যেমনটি উল্লেখ করেছেন আর-রামলী শাফিঈ।
এর ব্যাখ্যায় ইবনুল আবিদীন শামী (রহ.) লেখেন-

(قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الرَّمْلِيّ الشَّافِعِيّ) أَيْ فِي شَرْحِهِ عَلَى مِنْهَاجِ النَّوَوِيِّ. وَنَصُّهُ: وَالْأَفْضَلُ الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ السِّيَادَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ ظَهِيرِيَّةٌ، وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ، وَبِهِ أَفْتَى الشَّارِحُ لِأَنَّ فِيهِ الْإِتْيَانَ بِمَا أُمِرْنَا بِهِ، وَزِيَادَةُ الْإِخْبَارِ بِالْوَاقِعِ الَّذِي هُوَ أَدَبٌ، فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِي أَفْضَلِيَّتِهِ الْإِسْنَوِيُّ. وَأَمَّا حَدِيثُ: لَا تُسَيِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، كَمَا قَالَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْحُفَّاظِ،

(তাঁর বক্তব্য: আল-রামলি আল-শাফি'ঈ এটি উল্লেখ করেছেন)–অর্থাৎ, ইমাম নববী -এর 'মিনহাজ' গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থে তিনি লিখেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "ইবন জাহিরিয়াহ বলেছেন, সাইয়্যিদুনা শব্দটি ব্যবহার করাই উত্তম। একদল আলেম স্পষ্টভাবে এ কথা বলেছেন এবং ব্যাখ্যাকার এ বিষয়ে ফতোয়াও দিয়েছেন; কারণ এর মধ্যে রয়েছে নির্দেশিত আমলটি পালন করা এবং বাস্তবতাকে তুলে ধরা। আর এটিই হচ্ছে আদব বা শিষ্টাচারের পরিচায়ক। তাই

এটি বর্জন করার চেয়ে উল্লেখ করাই উত্তম, যদিও আল-ইসনাউই এটা উত্তম হওয়ার বিষয়ে কিছুটা দ্বিধা পোষণ করেছিলেন।" আর "নামাজে আমাকে 'সাইয়িদুনা' বলে সম্বোধন করো না"–এই হাদিসটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট; পরবর্তীকালের কয়েকজন হাফিযে হাদিস এমনটাই বলেছেন।)

নামাযের বাইরে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তিকে নিষেধ করেছেন যে তাঁকে 'সাইয়্যিদুনা' বলে সম্বোধন করেছে, যেমনটি একটি মাশহুর হাদিসে বর্ণিত আছে (এটি আবু দাউদের বর্ণিত সেই একই হাদিস, যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে)। কিন্তু নবীর এই নিষেধাজ্ঞা সম্ভবত বিনয় কিংবা সামনাসামনি প্রশংসা করা অপছন্দের কারণে অথবা এটি জাহেলী যুগের প্রথা ছিল বলে, কিংবা তিনি অনেক বেশি বাড়িয়ে বলেছিলেন বলে। হতে পারে, তিনি জাহিলিয়তের রীতি অনুসরণ করে প্রশংসা করেছিলেন। যেমন তারা বলত, "আপনি আমাদের সাইয়্যিদ, আপনি আমাদের পিতা, আপনি শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনে আপনি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি **جفنة الغراء**।" জাহিলিয়াতের যুগে একটি উক্তি প্রচলিত ছিল যে, তারা তাদের মহান নেতাদের উদ্দেশ্যে অতিরঞ্জিত করত যারা বেশি বেশি করে খাওয়াতেন, বড় বড় পাত্রে দুম্বার গোশত, ঘি ইত্যাদি খাওয়াতেন। সুতরাং, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরণের শব্দ প্রয়োগকে নিষেধ করে বলেছেন, "শয়তান যেন তোমাকে অতিরঞ্জিত করতে প্রলুব্ধ না করে।" কারণ সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **انا سيد ولد ادم**" (আমি আদম সন্তানদের সাইয়্যিদ)। এছাড়াও হাদীসে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নাতি হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বলেছেন, "**ابني هذا سيد**" (আমার এই সন্তান হচ্ছেন সাইয়্যিদ)। একইভাবে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে তাঁর গোত্রের লোকদেরকে বলেছেন, "তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়াও।"

ইমাম আন-নাসাঈ-এর '**عمل اليوم والليلة**' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, হযরত সাহল বিন হুনাইফ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "হে সাইয়্যিদ" বলে সম্বোধন করেছেন। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত দুরূদ শরীফে **اللّٰهم صلّ علٰي سيد المرسلين** কথাটি উল্লেখ আছে। উপরোল্লেখিত আলোচনায় **سيدنا** শব্দটি বলা জয়েয হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এটি অস্বীকার করে তার জন্য আবশ্যক তার কথার পক্ষে দলীল পেশ করা। কারণ উপরোল্লেখিত হাদীসে ভিন্ন সম্ভাবনা থাকার কারণে তা (নাজায়েয হওয়ার) দলীল হিসেবে পেশ করা যাবে না।

এটা সুস্পষ্ট, যেমনটি উপরেও উল্লেখ করা হয়েছে, যে সার্বভৌমত্বের পূর্ণতা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য, কিন্তু এমন কোনো প্রমাণ নেই যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপর 'সাইয়্যিদ' শব্দ প্রয়োগ করাকে অবৈধ করে তোলে। পবিত্র কুরআনে নবী হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম সম্পর্কে "سيدا وحصورا" শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলতেন: ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا ''আবু বকর আমাদের নেতা এবং তিনি আমাদের নেতা অর্থাৎ বিলালকে মুক্ত করেছিলেন।"

আল্লামা আইনি শারহে বুখারীতে লিখেছেন যে, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদেরকে হযরত সাদ সম্পর্কে বলেছিলেন, قوموا الي سيدكم "তোমাদের নেতার জন্য উঠে দাঁড়াও।" তাই এটা থেকে দলীল দেওয়া যায় যে, যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে سيدي 'আমার সায়্যিদ' কিংবা مولاي 'আমার মাওলা' বলে, তবে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না, কারণ কর্তৃত্ব ও সম্পদের উৎস হলো তার অধীনস্থদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের জন্য উত্তম পরিকল্পনা। এ কারণেই স্বামীকে 'সায়্যিদ' বলা হয়। যখন ইমাম মালিক (রহ.) পবিত্র কুরআনের আয়াত والفيا سيدها তিলাওয়াত করেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, মদীনা মুনাওয়ারায় কেউ কি তার সরদারকে يا سيدي সম্বোধন করাকে অপছন্দ করেন। হযরত ইমাম মালিক রাহ. জবাব দিলেন,"কেউ না।"

ইমাম বুখারীও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি উক্তি 'من سيدكم থেকে এর বৈধতার পক্ষে দলীল দিয়েছেন। এটি একটি হাদিসের অংশবিশেষ, যা ইমাম বুখারী নিজেই 'আল আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাদিসটিতে বলা হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু সালামাহকে বলেছিলেন- من سيدكم ''তোমাদের সাইয়্যিদ কে?" তারা জবাবে বললেন, জাদ্দ বিন কায়স।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ''না, বরং তোমাদের সাইয়্যিদ হলেন আমর ইবনুল জামুহ।" এছাড়াও একটি মাশহুর হাদীস اذا نصح العبد سيده যা একাধিক সাহাবী থেকে বুখারী শরীফসহ অধিকাংশ হাদীসের কিতাবে রয়েছে। এছাড়াও, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত বুখারী শরীফের হাদীস কেউ যেন তার মনিবকে اطعم ربك وضئ ربك না বলে বরং তার বলা উচিত, "سيدي ومولاي।" এ হাদীসে কাউকে 'সাইয়্যিদ' ও 'মাওলা' বলার বিধান সুস্পষ্ট।

CamScanner

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামের পূর্বে মাওলানা ব্যবহারের হুকুম

যাককারী কান্দুলভী সাহেব "ফাজায়েলে দুরুদ শরীফ" কিতাবে লেখেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নামের সাথে **مولٰنا** শব্দ ব্যবহার কিছু লোক পছন্দ করে না। এখন পর্যন্ত এই নিষ্ফল অনুসন্ধান সত্ত্বেও এর কোনো নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং উহুদ যুদ্ধের বর্ণনায় আবু সুফিয়ানের জবাব দিতে গিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **الله مولٰنا ولا مولٰي لكم** "আল্লাহই আমাদের মাওলা, তোমাদের কোনো মাওলা নেই।" পবিত্র কুরআনের সূরা মুহাম্মদে বলা হয়েছে যে, **ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ** "আল্লাহ মুমিনদের মাওলা, এবং কাফিরদের কোনো মাওলা নেই।" কিন্তু এটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে 'মাওলা' শব্দটি প্রয়োগের নিষেধাজ্ঞা নির্দেশ করে না। এখানেও, অভিভাকত্বের পরিপূর্ণতা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃত মাওলা হচ্ছেন আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বা। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন:

مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

আল্লাহ ছাড়া তোমার কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই। এবং অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে, **الله وليُّ المؤمنين** (আল্লাহ মুমিনদের ওলী)।

বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীস- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, **مَنْ تَرَكَ كلاّ او ضياعا فانا وليُّه** "যে ব্যক্তি কোনো ঋণ কিংবা অসহায় সন্তানাদি রেখে মারা যায়, আমি তার অভিভাবক।" এখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকেই ওলী বলেছেন। তাছাড়া ইতিপূর্বে বুখারী শরীফের হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- **وليقل سيدي ومولاي** ''তার বলা উচিৎ আমার সাইয়্যিদ ও আমার মাওলা।" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আরেকটি মাশহুর হাদীস হলো- **مولي القوم من انفسهم**

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

"এবং পিতা-মাতার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে আমি প্রত্যেকের জন্য একজন করে 'মাওলা' তৈরি করেছি।" আর হাদিস ও ফিকহের কিতাবসমূহের নিকাহ অধ্যায় ওলীর বিবরণ দিয়ে পরিপূর্ণ।

মিশকাত শরীফে বুখারী ও মুসলিম শরীফের সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ বিন হারিসাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন- **انت اخونا ومولانا** "তুমি আমাদের ভাই ও মাওলা।" এছাড়াও, মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী শরীফে হযরত যায়েদ বিন আরকাম হতে বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণীটি উদ্ধৃত করা হয়েছে: **من كنت مولاه فعليّ مولاه** ''আমি যার মাওলা, আলী তার মাওলা।" এই হাদিসটি বিখ্যাত এবং অনেক সাহাবী এটি বর্ণনা করেছেন। মোল্লা আলী কারী এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, 'মাওলা' শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন পালনকর্তা, মালিক, সাইয়্যিদ, নিআমত প্রদানকারী, গোলাম আযাদকারী, সাহায্যকারী, যে ভালোবাসে, অনুসারী, প্রতিবেশী, চাচাতো ভাই, আশ্রয়দাতা, ইত্যাদি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এজন্য উপযুক্ত স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা হবে। যেখানে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **الله مولٰنا ولا مولٰي لكم** বলেছেন সেখানে অর্থ হবে রব বা পালনকর্তা। আর যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **من كنت مولاه فعليّ مولاه** বলেছেন সেখানে সাহায্যকারী অর্থে ব্যবহৃত হবে।

এই হাদিসটি বর্ণনার পেক্ষাপট সম্পর্কে মোল্লা আলী কারী লিখেছেন: হযরত উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছিলেন যে, আপনি আমার মাওলা নন, আমার মাওলা হচ্ছেন রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এর জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা।

আল্লামা সাখাওয়ী 'আল-কাউলুল বাদী' গ্রন্থে এবং আল্লামা কাসতালানী 'মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ' গ্রন্থে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় নামগুলোর মধ্যে 'মাওলা' শব্দটিকে তালিকাভুক্ত করেছেন।

আল্লামা যুরকানি লিখেছেন যে, 'মাওলা' মানে সাইয়্যিদ, সাহায্যকারী, প্রেমিক, আর এটি আল্লাহ তাআলার অন্যতম একটি নাম। আল্লামা কাসতালানি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী **انا اولٰي بكل مؤمن** দ্বারা দলীল দেন। এরপর, আল্লামা যুরকানি, আল্লামা কাসতালানির কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামসমূহের ব্যাখ্যায় বলেন যে, 'ওলী' ও 'মাওলা' এই দুটিই আল্লাহর নাম এবং উভয়ের অর্থই হলো 'সাহায্যকারী'। যেমন ইমাম বুখারী রাহ. হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- **انا ولي كل مؤمن** "আমি সকল মুমিনের ওলী।" তিনি হলেন সকল মুমিনের

মধ্যে প্রথম ও অগ্রগণ্য।" এবং স্বয়ং বুখারীতেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী বর্ণিত হয়েছে যে, এই দুনিয়া ও পরকালে এমন কোনো মুমিন নেই যার কাছে আমি প্রথম ও অগ্রগণ্য নই। সুতরাং যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, তা তার উত্তরাধিকারীদেরকে দেওয়া উচিত, এবং যে ব্যক্তি ঋণ বা হারানো জিনিস রেখে যায়, সে যেন আমার কাছে আসে, কারণ আমিই তার মাওলা। এছাড়াও, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আমি যার মাওলা, আলী তার মাওলা। ইমাম তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং একে 'হাসান' বলেছেন।

আল্লামা রাযী (রহ.) সূরা মুহাম্মদ-এর মহিমান্বিত আয়াত: وَأَنَّ الْكَٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ "আর নিশ্চয়ই কাফিরদের কোনো অভিভাবক নেই।" এর তাফসীরে লিখেছেন যে, যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উপরের আয়াত এবং অন্য একটি আয়াত ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ "অতঃপর তারা আল্লাহর দিকে ফিরে গেল, যিনি তাদের প্রকৃত অভিভাবক," এই দুই আয়াতের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় করা উচিত। তাহলে বলা হবে যে 'মাওলা' শব্দটির একাধিক অর্থ রয়েছে। 'মাওলা', 'রব', সাহায্যকারী ইত্যাদি। যেখানে বলা হয়েছে কোনো মাওলা নেই, তার অর্থ হলো কোনো সাহায্যকারী নেই। আর যেখানে বলা হয়েছে مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ সেখানে তার অর্থ হবে রব ও মালিক।

সূরা আন'আমের مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ আয়াতের ব্যাখ্যায় জালালাইন এটাই বলেছেন। এর সাথে, 'জুমাল' গ্রন্থকার লিখেছেন যে, উক্ত আয়াতে 'মালিক' শব্দের এই তাফসীর করা হয়েছে, কারণ এ আয়াতে মুমিন ও কাফির উভয়ের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে, অর্থাৎ সূরা মুহাম্মদে, উল্লেখ করা হয়েছে যে, "কাফিরদের জন্য কোনো অভিভাবক নেই।" উভয় ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্য এভাবে যে, প্রথম আয়াতে 'মাওলা'-এর অর্থ স্রষ্টা ও আল্লাহ, এবং দ্বিতীয় আয়াতে সাহায্যকারী। সুতরাং, কোনো বিরোধ নেই। এ ছাড়াও, এটা নির্দেশ করার অনেক কারণ রয়েছে যে, যখন 'মাওলা' শব্দটি রব ও মালিকের অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন তা সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, কিন্তু যখন এটি 'সরদার' এবং অন্যান্য অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন তা কেবল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যই নয়, বরং প্রত্যেক মহান লোকদের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী আয়াতে, দাসদের সম্পর্কে নবীর নির্দেশ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা যেন তাদের মনিবকে 'সাইয়্যিদি' এবং 'মাওলাই' শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে।

CamScanner

মোল্লা আলী ক্বারী ইমাম আহমদ (রহ.) এর সূত্রে হযরত রাবাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একটি দল কুফায় হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু'র কাছে এলেন, তারা এসে বললেন, **السلام عليك يا مولانا** ''আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আমাদের মাওলা।'' হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, ''আমি তোমাদের মাওলা কীভাবে? তোমরাতো আরব।'' তারা বললেন, ''আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন- **من كنت مولاه فعليّ مولاه** ''আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা।'' যখন সেই দলটি চলে যেতে শুরু করল, আমি তাদের অনুসরণ করলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম এই লোকেরা কারা। আমাকে বলা হলো যে, এটি আনসারদের একটি দল, যার মধ্যে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহুও ছিলেন।

হাফিজ ইবনে হাজার, 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে এই বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, মাওলা শব্দের প্রয়োগ নেতৃস্থানীয় লোকের উপর অপছন্দনীয় না হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। এর কারণ হলো 'সাইয়্যিদ' শব্দটি শুধু উচ্চের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু 'মাওলা' শব্দটি উচ্চ ও নিম্ন উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়। (ফাজায়েলে দুরূদ শরীফ, যাকারিয়া কান্দুলভী)

CamScanner